THE GREAT LAST KHOLIFA

সুলতান আবদুল হামিদ

THE GREAT LAST KHOLIFA

সুলতান আবদুল হামিদ

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
অনূদিত

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

সুলতান আবদুল হামিদ

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন এন্ড বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

সর্বসত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুন নূর : ০১৮৫৭-১৮৯১৪৪
মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০২৫৩
মাকতাবাতুল ইসলাম : ০১৯১২-৩৯৫৩৫১
সমকালীন প্রকাশন : ০১৬১৬-৬২৬ ৬৩৬

যাত্রাবাড়ি কিতাব মার্কেট পরিবেশক : মোল্লার বই.কম : ০১৮৩৩-২৫৩১১৭

অনলাইন পরিবেশক

❐ Well Reachbd.com, ❐ রকমারি ❐ ওয়াফি লাইফ, ❐ সিজদাহ.কম ❐ বই বাজার, ❐ শব্দালয়

মূল্য : BD ৳ ২৭০, US $ 10, UK £ 6

SULTAN ABDUL HAMID

Writer : Dr. Ali Muhammad Sallabi
Translated by : Kazi Abul Kalam Shiddique
Editor : Salman Mohammad

Published by
Muhammad Publication
Gias Garden $ Book Complex, Shop # 122
37 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-7343-1

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

লেখকের নেকহায়াত ও
ইমানি জীবনের প্রত্যাশ্যায়...

প্রকাশকের কথা

আমরা আজ ইতিহাসের এমন এক দিকপাল মহান সুলতানের গল্প বলতে যাচ্ছি, যিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ খলিফা; যিনি দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় (১৮৭৬-১৯০৯) শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আমরা আজ আপনাদের সামনে এমন এক মহান নেতাকে পরিচয় করিয়ে দেব, যিনি ইউরোপীয় শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন। প্রতিবাদে বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

পাঠক এ বইটি থেকে জানতে পারবেন সেই সুলতানের জীবনচরিত, যিনি মানুষের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়ে, অসংখ্য বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে, মক্কা শহরকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য আধুনিক পানি সঞ্চালন পদ্ধতি চালু করে, ইস্তাম্বুল, ফিলিস্তিন ও মদিনা শহরকে সংযুক্ত করে 'হিজাজ রেল-লাইন' চালু করে আজও গোটা পৃথিবীর মাঝে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি তার সমসাময়কি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য প্রশংসিত ছিলেন।

আপনি কি জানেন তিনি কে? তিনি সুলতান আবদুল হামিদ। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ? হ্যাঁ, সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কথাই বলছি। তার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীকে প্রায় সাড়ে ১৩০০ বছর শাসন করা খিলাফত পতনের ইতিহাস।

যখন ইহুদিরা ফিলিস্তিনের ভূমি পেতে বিনিময়ে খিলাফত রাষ্ট্রের সকল ঋণ পরিশোধ করার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি এ ভূমি কখনোই তাদের হাতে তুলে দেব না, এটা অর্জন করতে আমাদের যত রক্ত আর প্রাণ দিতে হয়েছে, আমাদের হাত থেকে নিতে হলে তাদেরও তত রক্ত আর প্রাণ দিতে হবে।'

তিনি জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত থাবা থেকে মুসলিমদের মুক্ত করে ঐক্য তৈরিতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি শুধু একজন সাহসী, ত্যাগী ও

বীর সুলতানই ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন অত্যন্ত তাকওয়াবান ও রাসুলপ্রেমী।

তবে এ বই নিয়ে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এ আলোচনা তো *'উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস'* বইয়েও রয়েছে, তবে কেন এই নতুন আয়োজন?

দুটি কারণে। এক. এমন একজন সুলতানের জীবনচরিত স্বতন্ত্র আলোচনায় আসা খুবই জরুরি। অনেক ইতিহাসপ্রেমী আছেন, অটোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে ততটা না জানলেও আবদুল হামিদকে জানার প্রবল আগ্রহ রাখেন। দুই. তাকে নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশে নানান ধরনের সিরিজ তৈরি হয়েছে। যেখানে তার প্রশংসনীয় জীবনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এক কলঙ্কের অধ্যায়। সেই সিরিজগুলোর কিছু কিছু বাংলায়ও প্রচারিত হয়েছে। তার জীবনচরিত ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হলে সেই সকল মানুষ তাকে স্পষ্টভাবে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। ফলে তার সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান ঘটবে।

মুহতারাম কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ও সালমান মোহাম্মদ ভাই, আপনাদের ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। সুতরাং ধন্যবাদ দিয়ে আপনাদের ছোট করতে চাই না। আল্লাহ আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

কাজী ভাইয়ের অনুবাদ আর সালমান ভাইয়ের সম্পাদনা সম্পর্কে পাঠককে নতুন করে কিছু বলার সুযোগ নেই। এ দুটি নামই ইতিমধ্যে পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

পরিশেষে সেই পুরানো কথাটিই বলতে চাই, আমরা একটি বইকে নিজের সন্তানের চেয়ে খুব কম মনে করি না। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়; তবে অস্বাভাবিক হলো, ভুল সম্পর্কে অবগত করার পর সেটা সংশোধন না করা। কিন্তু মুহাম্মদ পাবলিকেশন ইতিপূর্বে এমন করেনি, হয়তো ভবিষ্যতেও করবে না।

প্রিয় পাঠক, তাই যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা বা যেকোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়ে, তা আমাদের অবহিত করবেন বলে আমরা আশা করি। আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

২৯ রবিউস সানি, ১৪৪০ হিজরি

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য, অথবা আমাদের সাহিত্য পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিতে অনুবাদ-ভিন্ন আমাদের অন্য কোনো আশ্রয় নেই। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব আবহ বা মেজাজ রয়েছে—যেমন প্রকৃতির রয়েছে নিজস্ব রোদ, বৃষ্টি ও তাপ, যা কখনো অন্য ভাষায় রূপান্তর সম্ভব নয়। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, এমন দুটো ভাষা নেই যার ফনোলজি বা ধ্বনিবিজ্ঞান অভিন্ন। কোনো দুই ভাষা নেই যার সাংস্কৃতিক ইতিহাস অভিন্ন, সে-কারণে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তার সাংস্কৃতিক চরিত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব নয় বলেই অনুবাদে যা অর্জন সম্ভব তা বড়জোর মূলের একটি ভাষান্তর। 'দোভাষী' হিসেবে অনুবাদকের কাজ 'মূল লেখক ও তার পাঠকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের দায়িত্ব পালন।' এই কারণে একই রচনা ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের হাতে স্বতন্ত্র রূপান্তর অর্জন করে। এ কথা বলেছেন ইংরেজ লেখক থিয়োডোর সাভোরি।

তাইলে সিদ্ধান্ত কী? সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যেখানে মূল গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ আছে সেখানে অনুবাদ পড়ার কোনো মানে হয় না। না, অনুবাদ পড়তেও পারেন, কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মূলটা না পড়ে কেবল অনুবাদটা পড়া—ওয়েল, পুরোটা গাধার কাজ বলব না, তবে কাজটা অনেকটা গাধার কাছাকাছিই।

না, সব ভাষায় তো আর আপনি পড়তে পারবেন না। আমাদের এখানে খুব কম লোক আছে যারা তুর্কি ভাষা বা আরবি ভাষা পড়তে পারেন। কিন্তু এইসব ভাষায় কালজয়ী সব সাহিত্যকর্ম হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবতা আপনারা ঠিকই জানেন। তাইলে? এরকম ক্ষেত্রে তো অনুবাদ ছাড়া উপায় নাই। এইসব ভাষার সাহিত্যের যতটুকুই আমরা জেনেছি সে তো অনুবাদকদের হাত ধরেই। এইসব ক্ষেত্রে তো অনুবাদ অনিবার্য। কিন্তু এইরকম অনিবার্য ব্যাপার না হলে—যেখানে মূল গ্রন্থটির ভাষা আপনার

জানা, যেমন ইংরেজি, উরদু—সেসব ক্ষেত্রে মূল ভাষায় পাঠ করার চেষ্টাটাই উত্তম।

যাইহোক, অনুবাদকের কথায় অনুবাদ নিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভবত উচিত না। আমরা বরং বইয়ের মূল টপিকেই ফিরে যাই। ড. শায়খ আলি মুহাম্মদ সাল্লাবিকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। বিচক্ষণ পাঠকগণ ইতিমধ্যে বইটির ফ্ল্যাপ ও অন্যান্য সূত্র থেকে তার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধরন-ধারণাও লেখক তার ভূমিকায় সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তবুও সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, আবদুল হামিদ ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের ৩৪তম সুলতান। উসমানি খিলাফতের সর্বশেষ মহান নেতা। ৩০ বছরেরও বেশি সময় (১৮৭৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত) শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন মুসলিমদের শেষ প্রতিরোধ শক্তি ও স্বাধীন খলিফা। তিনি সে-সময়ের বুজুর্গ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে ইলম ও আখলাকের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আরবি-ফারসি ভাষায় তার দক্ষতা ছিল। আগ্রহী পাঠক ছিলেন ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতার। উসমানি তুর্কি ভাষায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনে চর্চা করতেন সুফি তরিকায়ও। অস্ত্রের ব্যবহার, তরবারির খেলা ও তির নিক্ষেপ এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবরের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে।

আবদুল হামিদ ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি ইউরোপিয়ানদের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন। বিখ্যাত হয়ে আছেন লোকজনের মাঝে ইসলামের ভালোবাসাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহু মাদরাসা, হাসপাতাল এবং ইউনিভার্সিটি। মক্কা ও মদিনা শহর রক্ষা করার জন্য মহান দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দুটি শহরের সহায়তা করেছিলেন বড় ধরনের ফান্ড প্রজেক্ট দিয়ে। মক্কা শহরকে বন্যা থেকে রক্ষা করার জন্য চালু করেছিলেন আধুনিক পানি সঞ্চালন পদ্ধতি। হিজাজে রেল-লাইন চালু করেছিলেন—যা ইস্তাম্বুল, ফিলিস্তিন ও মদিনা শহরকে সংযুক্ত করেছিল। তিনি প্রশংসিত ছিলেন তার সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য। তাইতো ব্রিটিশ এডমিরাল লর্ড জন ফিসার বলেছেন, 'তিনি সমস্ত ইউরোপবাসীর চেয়ে দক্ষ কূটনীতিবিদ ছিলেন।' জার্মান চ্যান্সেলর অট্টো ভন বিসমার্ক বলেছেন, 'ইউরোপের সমস্ত মানুষের বুদ্ধিমত্তার ৯০% -ই ছিল আবদুল হামিদের। ০৫% আমার নিজের এবং বাকি ০৫% সমস্ত মানুষের!'

খলিফা আবদুল হামিদের শাসনকাল ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে উসমানিয়ার অন্যতম অঞ্চল বুলগেরিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেন খলিফা আবদুল হামিদ। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়া বুলগেরিয়ার ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে খিলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়ায় সর্বাত্মক আক্রমণের মুখে উসমানি সৈন্যরা টিকতে পারেনি ময়দানে। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে উসমানিয়া রাশিয়ার সাথে স্যান স্টিফানো চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া দবরুজা অঞ্চলসহ প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করে। দানিউব অঞ্চলে উসমানি দুর্গগুলো ভেঙে ফেলতে হয়। রাশিয়া এশিয়া ভূ-খণ্ডের বার্টুম, কারস, আরদাহান ও বায়েজিদ প্রভৃতি অঞ্চল লাভ করে। বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্তশাসিত করদ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। আলবেনিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয় বুলগেরিয়ার সীমানা। সার্বিয়ার স্বাধীনতা আবারও স্বীকৃত হয়। মন্টিনিগ্রোর সীমান্ত পর্যন্ত সার্বিয়ার সীমানা সম্প্রসারিত হয়। স্বীকৃত হয় রুমানিয়ার স্বাধীনতা। বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে একজন খ্রিষ্টান গভর্নর জেনারেলের অধীনে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়।

১৮৭৬ সাল হতে মিদহাত পাশার নেতৃত্বে ইয়াং তুর্কস ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং দেশের ভেতরে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবির অনুকূলে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াং তুর্কসের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে খলিফা অনেকটা বাধ্য হয়ে সংবিধান ঘোষণা করেন। এটি ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাসে প্রথম কোনো সংবিধান। এ সংবিধান অনুসারে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ যা উচ্চকক্ষ (সিনেট, মজলিসে আয়ান) ও নিম্নকক্ষে (চেম্বার অব ডেপুটি, মজলিসে নবাব) দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একই সাথে খলিফা উজিরে আজম হিসেবে মিদহাত পাশার নামও ঘোষণা করেন এবং সংবিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ জারি করেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, ৭১ জন মুসলিম, ৪৪ জন খ্রিষ্টান ও চার জন ইহুদি সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২৬ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষে ২১ জন মুসলিম, অন্যরা সকলে অমুসলিম।

এ সাংবিধানিক সংস্কারের ফলে খিলাফতে উসমানিয়াকে ক্রমান্বয়ে একটি ইউরোপীয় ধাঁচের গণতান্ত্রিক, তুর্কি জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ইয়াং তুর্কসের প্রচেষ্টা সফল হতে যাচ্ছিল। অন্যদিকে খলিফা আবদুল হামিদ এ ধরনের খ্রিষ্টীয় ও ইহুদি ফ্রিম্যাসনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইউরোপ সফরের সময় থেকে সচেতন ছিলেন। তিনি ছিলেন পশ্চিমা

গণতন্ত্র, ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ও জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। শেষে পশ্চিমা দর্শন থেকে খিলাফতে উসমানিয়াকে নিরাপদ রাখতে ইসলামি শিক্ষার আলোকে সাম্রাজ্যে সংস্কার, ইসলামি নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন ও ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

খলিফা আবদুল হামিদ সুফি সিলসিলাসমূহের প্রতি ইসলামি ঐক্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে তিনি মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রীয় ভাষা হিসেবে আরবিকে খিলাফতে উসমানিয়ার রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবদুল হামিদ ক্ষমতায় এসে দেখতে পান, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও তার কারিকুলাম সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে উঠেছে। তিনি শিক্ষাকারিকুলামে ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া অশ্লীলতা ও অবাধ মেলামেশা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদি নেতা থিয়োডোর ইহুদিদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনের দাবি নিয়ে খলিফা আবদুল হামিদের সাথে দেখা করেন এবং এর বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা অফার করেন। খলিফা স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দেন, 'ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমির এক মুষ্ঠি মাটিও আমি ইহুদিদের দিতে পারব না। এটির মালিক আমি নই, ফিলিস্তিনে পুরো মুসলিম উম্মাহর মালিকানা রয়েছে। এই ভূমির পবিত্রতা রক্ষায় আমার পূর্বপুরুষরা আজীবন লড়েছেন, নিজেদের রক্ত সিঞ্চিত করে পবিত্র ভূমির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ইহুদিদের কোটি কোটি ধন-সম্পদ তাদের কাছেই রাখুক। যখন আমার সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হবে, সেদিন ফিলিস্তিন কোনো বিনিময় ছাড়াই তারা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ খিলাফত ভেঙে টুকরো টুকরো করার আগে আমি আবদুল হামিদের দেহ-অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে হবে। যতই চেষ্টা করো আবদুল হামিদ বেঁচে থাকতে ফিলিস্তিনের এক মুষ্ঠি মাটিও ইহুদিরা পাবে না।'

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা চক্রান্ত ও পাশ্চাত্যের আদর্শে দীক্ষিত সেকুলারপন্থি তরুণ তুর্কি বিপ্লবের মাধ্যমে তাকে মসনদ থেকে পদচ্যুত করে। এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা আমরা জানতে পারব এই গ্রন্থে। সুলতান আবদুল হামিদের জীবনী ড. সাল্লাবি তুলে ধরেছেন বেশ ঋজু বর্ণনাভঙ্গিতে। প্রাঞ্জল ভাষায়। তার শব্দ যেমন সুচয়িত, গাঁথুনি তেমন মজবুত। চেষ্টা করেছি অনুবাদ

যথাসাধ্য সাবলীল ও সরল রাখার। এ ছাড়া টীকার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অংশে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

বইটি রচনার কাজ সমাপ্ত করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে মুহতারাম প্রকাশক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান সাহেবের তাড়া না পেলে হয়তো এত দ্রুত বইটি আলোর মুখ দেখত না। তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এদিকে মানুষ তো তার উৎসমূলের বাইরে নয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। এতে অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ভুল-ভ্রান্তি, অসামঞ্জস্যতা, অসংলগ্নতা, বাতুলতা, বাক্য বা শব্দপ্রয়োগে জটিলতা কিংবা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির উপকারিতা ব্যাপক হোক এবং এর সৌরভ মোহিত করুক সবাইকে—এ প্রত্যাশায় ..

—কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

১৪ নভেম্বর ২০১৯

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তার কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে আনতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহই আমার ইলাহ। তার কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে ইমরান, ১০২]

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব, ৭০-৭১]

হামদ ও সালাতের পর...

এই গ্রন্থটি আমার *আদদাওলাতুল উসমানিয়া আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত* গ্রন্থের অংশ। বহুবিদ উপকার এবং মুসলিম জাতির সামনে তৎকালীন প্রকৃত ইতিহাস তুলে দেবার লক্ষ্যে এটা পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি আলোচনা করবে, সুলতান আবদুল হামিদের বিরাট অবদানের কথা। ইসলামের খেদমতে, সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষায় এবং

খিলাফতের পতাকাতলে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তার প্রচেষ্টার কথা। জানাবে, সুলতান আবদুল হামিদের সময় কীভাবে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামি ঐক্যের চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামি ঐক্য ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতান আবদুল হামিদ যেসব উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে। যেমন : দ্বীন প্রচারকদের সাথে মিলিত হওয়া, সুফি-সাধকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, সাম্রাজ্যের আরবীয়করণ, মাদরাসাতুল আশায়ির নির্মাণ, হিজাজের রেল-লাইন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়া। বইটি গুরুত্বের সাথে জানাবে জার্মান বিদ্রোহী, বলকান জাতীয়তাবাদী দল, কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস আন্দোলন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিচ্ছিন্নতাবাদী শত্রুদের সমর্থনের পেছনে আন্তর্জাতিক জায়নবাদী আন্দোলনের প্রচেষ্টার কথা। জানাবে, কীভাবে ইসলামের শত্রুরা সুলতান আবদুল হামিদকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। উসমানি খিলাফতকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল? কীভাবে খলনায়ক মুস্তফা কামালের আবির্ভাব হয়েছিল—সে কথা জানাবে বইটি। যে মুস্তফা কামাল তুরস্ককে ইসলামি বিশ্বাস থেকে হটিয়ে দিয়েছে, ধর্মের সাথে লড়াই করেছে, ধর্মীয় প্রচারকদেরকে নানাভাবে অত্যাচার করেছে এবং আহ্বান করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে।

তুরস্কে ইসলামের সুলক্ষণ এবং ইসলামি আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে বইটি বিরত থাকেনি এবং পাঠককে তুরস্ক এবং সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যতে ইসলামের বিচ্ছুরিত আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বঞ্চিত করেনি।

বইটির শেষাংশে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে কুরআনি দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ। পাঠকের কাছে বর্ণনা করবে, সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ হচ্ছে—

আল-ওয়ালা ওয়াল বারার মতো আকিদার ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উম্মাহর সরে যাওয়া। ইবাদতের সঠিক চিন্তা থেকে উম্মাহর পিছিয়ে পড়া। শিরক, বিদআত এবং নানা অপব্যাখ্যার সয়লাব। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় বিকৃত সুফিবাদ একটি শক্তিশালী শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া, যা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ বহির্ভূত আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং ইবাদতের আমদানি করেছে। বইটি মুসলিম পাঠককে উম্মাহকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে শিয়া ইসনা আশারিয়া, নাসিরিয়্যাহ, ইসমাইলিয়্যাহ, কাদিয়ানিয়্যাহ, বাহাইয়্যাহ প্রমুখ

ভ্রান্ত দলগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করবে। বইটি আলোচনা করবে উম্মাহর ধ্বংসের পেছনে কারণ হচ্ছে, ঐশী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং উলামায়ে কেরাম অত্যাচারী শাসকদের হাতের পুতুল বনে যাওয়া। আলেমগণ যখন উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে তখন উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বইটি জানাবে, কীভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের শেষভাগে এসে ধর্মীয় শিক্ষা নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল।

এ বইটি জানাবে, কীভাবে উলামায়ে কেরাম কিতাবের মুখতাসার তথা সংক্ষিপ্ত ভাষ্য, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, হাশিয়া এবং তাকরির মুখী হয়ে পড়েছিল এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত ইসলামি প্রকৃত চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বহু আলেম ইজতিহাদের দরজা চালু থাকাকে অস্বীকার করেছিলেন। একপর্যায়ে ইজতিহাদি কার্যক্রম হয়ে গিয়েছিল বিরাট অপরাধতুল্য। মুতাকাল্লিদিন এবং অনাগ্রহীদের কাছে তা কুফরিসম হয়ে পড়েছিল।

বইটি উপস্থাপন করেছে উসমানি সাম্রাজ্যের গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়া অত্যাচার, বিলাসিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ততা, অত্যধিক মতানৈক্য এবং বিচ্ছিন্নতার কথা। ফলে সাম্রাজ্য বিপজ্জনকভাবে আল্লাহর শরিয়াহ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানগত, চারিত্রিক এবং সামাজিক দুর্বলতা ঘিরে ধরেছিল। জানাবে, কীভাবে এই উম্মাহ শত্রুর প্রতিরোধ এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কীভাবে ক্ষমতার শর্তাবলি এবং তার মৌলিক ও নৈতিক উপকরণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং কোনো জাতির উত্থান এবং পতনে আল্লাহর রীতিসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে উম্মাহর চেতনা নুইয়ে পড়েছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

'যদি সে জনপদের লোকেরা ইমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান এবং জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।' [সূরা আ'রাফ : ৯৬]

আমার এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমি মূলত সুলতান আবদুল হামিদ সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট কল্পকাহিনির মূলোৎপাটন করে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবিদদের থেকে ঘটনাসমূহ একত্রীকরণ, বিন্যস্তকরণ এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। নিজেদের মধ্যকার আকিদা-বিশ্বাস এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বের ফলে জনগণের ভেতর সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদি তা কল্যাণজনক হয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। যদি কোনো কথায় ভুল হয়ে থাকে, আমাকে তা জানালে অবশ্যই আমি তা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেব।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রার্থী

—ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

সূচিপত্র

সুলতান আবদুল হামিদ

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৩
সুলতান আবদুল হামিদ ২৩
এক. চাচা সুলতান আবদুল হামিদের সাথে ইউরোপ সফর ২৪
দুই. খিলাফতের বায়আত ও সংবিধান ঘোষণা ২৬
তিন. বলকানের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লব ৩৪
চার. রাশিয়া এবং উসমানি সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ৩৬
সান স্টেফানোর চুক্তি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ (১২৯৫ হিজরি) ৪০
বার্লিন সম্মেলন (১৩০৫ হিজরি; ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৪৫
ইসলামি ঐক্য ৪৫
এক. জামালুদ্দিন আফগানি এবং সুলতান আবদুল হামিদ ৪৯
দুই. সুফি সিলসিলা ৫৩
তিন. সাম্রাজ্য আরবিকরণ প্রচেষ্টা ৫৫
চার. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নারীদের পর্দার ব্যাপারে সুলতানের সংস্কার কর্মসূচি ৫৬
পাঁচ. ইস্তাম্বুলের আরব উপজাতি বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ৫৮
ছয়. হিজাজ রেলপথ ৬১
মানুষের সহানুভূতি অর্জন এবং তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার কৌশল ৬৪
সাত. শত্রুদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করতে আবদুল হামিদের পরিকল্পনা ৬৫
আট. লিবিয়ায় ইতালীয় স্বার্থ ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬৯
সুলতান আবদুল হামিদ ৬৯

এবং ইহুদিগোষ্ঠী
এক. ডোনেম ইহুদি ৭০
দুই. সুলতান আবদুল হামিদ এবং বিশ্ব ইহুদি নেতা থিয়োডোর হার্জেল ৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮১
সুলতান আবদুল হামিদ এবং জমিয়তুল ইত্তিহাদি ওয়াত তারাক্কি ৮১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮৯
সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ-এর পতন ৮৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৯৯
ফেডারেল শাসন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৯
উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ১১৯
এক. ইসলামের শত্রুতা-মিত্রতার আকিদা থেকে দূরে সরে ১২৩
দুই. ইবাদতের মর্মার্থ সীমিত হয়ে যাওয়া ১৩২
তিন. শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের প্রসার ১৪২
বিদআত ও অহেতুক কাজের বিস্তার ১৪৭
কুসংস্কারের বিস্তার ১৪৮
চার. পথভ্রষ্ট সুফিবাদ ১৪৮
পাঁচ. বিপথগামী দলসমূহের অপতৎপরতা ১৫৭
ছয় : রব্বানি নেতৃত্বের অনুপস্থিতি ১৬০
সংক্ষিপ্তসারের প্রস্তুতি ১৬৫
টীকা, ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও নোট ১৬৬
শিক্ষাসনদ ১৬৭
সাত. দ্বীনি পদ উত্তরাধিকার সম্পত্তি হয়ে যাওয়া ১৬৮
আট. রাষ্ট্রজুড়ে অন্যায়-অবিচার বেড়ে যাওয়া ১৭০
নয় : বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিমগ্নতা ১৭৩
দশ : মতবিরোধ ও কোন্দল ১৭৬
পরিশিষ্ট ১৮১
অনুবাদক পরিচিতি ১৮৭

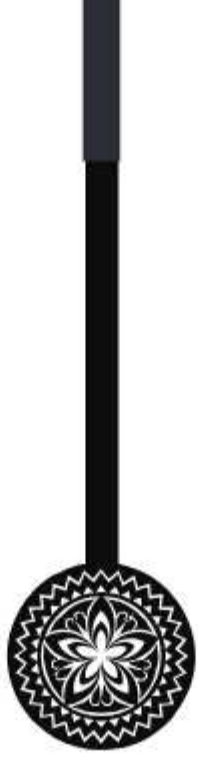

সুলতান আবদুল হামিদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান আবদুল হামিদ

[১২৯৩-১৩২৬ হিজরি/১৮৭৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ]

সুলতান আবদুল হামিদ উসমানি সাম্রাজ্যের ৩৪তম সুলতান। তিনি ৩৪ বছর বয়সে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬ শাবান ১২৫৮ হিজরি (১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ) তার জন্ম।

সুলতান আবদুল হামিদের ১০ বছর বয়সে তাঁর মা ইনতিকাল করেন। তার সৎমা ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন। সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। লালন-পালন করেন আপন মায়ের স্নেহ-মমতায়। আবদুল হামিদকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমনকি ইনতিকালের সময় তিনি তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আবদুল হামিদের নামে দিয়ে যান। সুলতান আবদুল হামিদ তার এই সৎমায়ের শিক্ষা দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন। তার ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনদারিতে মুগ্ধ ছিলেন তিনি। ফলে আজীবন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি লালন করেছেন বিমুগ্ধভাবে।

আবদুল হামিদ 'কাসরে সুলতান' তথা রয়্যাল প্রাসাদের সর্বাধিক বিখ্যাত শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় ছিল তার অনন্য দক্ষতা। ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন ভাষা-সাহিত্যে। তাসাউফশাস্ত্রেরও ছিলেন গভীর পণ্ডিত। উসমানি তুর্কি ভাষায় রচিত কিছু কবিতাও আছে তার। কবিতার মাধ্যমে তিনি আপন ভাবনাগুলো প্রকাশ করতেন।[১]

তিনি অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তরবারি চালনা ও তিরন্দাজিতেও দক্ষতা অর্জন করেন। বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারতেন। নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। গভীরভাবে লক্ষ রাখতেন বিশ্বরাজনীতির প্রতি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির সংবাদ খুব গুরুত্বের সঙ্গে এবং নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করতেন।

---

[১] মুহাম্মদ হারব, *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৩১।

এক. চাচা সুলতান আবদুল আজিজের সাথে ইউরোপ সফর

সুলতান আবদুল আজিজ যখন ইউরোপ সফর করেন। উচ্চপদস্থ একটি প্রতিনিধিদলও তার সঙ্গে ছিল। সেই প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ছিলেন আবদুল হামিদ। তিনি ইউরোপীয়দের সামনে তাঁর সাধারণ পোশাক এবং সৌম্য অবয়ব নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।[২]

আবদুল হামিদ এই সফরের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেন। এ লক্ষ্যে বিশেষ তথ্যও জেনে নেন। পাশ্চাত্যে তিনি যা কিছু দেখেছেন, সবকিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সঠিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। উসমানি প্রতিনিধিদলটি তৎকালীন ইউরোপের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। যেমন : ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন, ইংল্যান্ডের কুইন ভিক্টোরিয়া, বেলজিয়ামের দ্বিতীয় লিওপোল্ড, জার্মানির প্রথম গ্রিয়াম, অস্ট্রিয়াতে ফ্রাসোয়াঁ জোসেফ প্রমুখ।[৩]

এর আগে প্রতিনিধিদলটি সুলতান আবদুল আজিজের সাথে মিসর সফর করে। সেখানে তারা ইউরোপীয় রেনেসাঁর মিথ্যা চাকচিক্য ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখে নেয়। তারা দেখে কীভাবে মিসরীয়রা ইউরোপকে আপন করে নিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করতে গিয়ে বিদেশি ঋণের জালে আটকা পড়েছে। খুব মন্দভাবে এই ঋণের মাশুল গুনতে হচ্ছে তাদের। তারা দেখেছে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে গভর্নর ইসমাইল পাশা অপব্যয়, অপচয় ও অতিরঞ্জনে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে মিসরকে তিনি বিদেশি ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এটা ছিল মিসরকে ইউরোপের একটি অংশ হিসাবে গড়ে তোলার খেসারত। মিসরের পর প্রতিনিধিদলটি ইউরোপ সফর করে। এই সফর ২১ জুন শুরু হয়ে ৭ আগস্ট ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সফরকালে উসমানি প্রতিনিধিদল পরিদর্শন করেছিল ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং হাঙ্গেরীয় রাজ্য অস্ট্রিয়া।

এই ইউরোপ-যাত্রায় আবদুল হামিদ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যার প্রভাব তার পুরো শাসনকালে প্রতিফলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. ইউরোপীয় জীবনাচার, জীবন পরিচালনার সমস্ত পদ্ধতি, যেমন : বিস্ময়কর অর্থনীতি, বিভিন্ন নীতি-নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ।

২. শিল্প ও সামরিক উন্নয়ন, বিশেষত ফরাসি এবং জার্মান স্থলবাহিনী এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনী।

---

[২] প্রাগুক্ত : ৩৩।
[৩] প্রাগুক্ত।

৩. বৈশ্বিক রাজনীতির কৌশল।

৪. উসমানি সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে ইউরোপীয়দের প্রভাব, বিশেষত তার চাচা সুলতান আবদুল আজিজের মাঝে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রভাব। নেপোলিয়ন মন্ত্রী আলি পাশাকে সমর্থন করার জন্য সুলতান আবদুল আজিজকে চাপ দিয়েছিলেন। অথচ সুলতান আবদুল আজিজ অনুভব করতে পারছিলেন না যে, কোনো বিদেশি শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে।[৪]

আবদুল হামিদ এই সফরে নিশ্চিত হয়ে যান, ফ্রান্স নিছক একটি খেলতামাশার দেশ, ইংল্যান্ড হলো ধনসম্পদ, কৃষি ও শিল্প-কারখানার দেশ, জার্মানি একটি সুসংহত, সামরিক ও প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী দেশ। জার্মানি তাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছিল, তাই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ক্ষমতাসীন হলে উসমানীয় সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে জার্মানে পাঠাবেন। মোটকথা, আবদুল হামিদ এই ভ্রমণে পাশ্চাত্যের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে তার দেশে আধুনিক উদ্ভাবনীশক্তি চালু করার ব্যাপারে আগ্রহী হন। বিশেষত শিক্ষামূলক, শিল্প, যোগাযোগ ও সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন, যার উদাহরণ—দুটি টার্পেডো বোট কেনা, টার্পেডো বোট আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সারাদেশে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি আধুনিক মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাতে আধুনিক বিজ্ঞানকে সিলেবাসভুক্ত করেছিলেন। তার আমলে দেশে প্রথমবারের মতো বাস-সার্ভিস চালু হয় এবং সাইকেল আমদানি হয়। পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতিও চালু হয় তার নির্দেশে। তবে সাম্রাজ্য পরিচালনায় পশ্চিমা চিন্তার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি।[৫]

আবদুল হামিদের এই সফরে ইউরোপ তাকে যুব প্রভাবিত করেছিল; তবে ইউরোপীয় কোনো বুদ্ধিজীবী দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি, সে যত সত্যবাদীই হোক না কেন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের যত কাছের লোকই হোক না কেন।

আবদুল হামিদের এই সফরে কূটনীতিকদের বিতর্কের বিষয়টি তাকে বেশ আকৃষ্ট করে। বিশেষত উসমানি প্রধানমন্ত্রী ফুয়াদ পাশার সাথে কতেক ইউরোপীয় নেতার যে সংলাপ হয়েছিল। সংলাপ চলাকালে ফুয়াদ পাশাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি ক্রিট দ্বীপটি কত দামে বিক্রি করবেন?

জবাবে পাশা বললেন, আমরা যে দামে কিনেছি। এর অর্থ হলো উসমানিরা ২৭ বছর ধরে ক্রিট সংরক্ষণের জন্য লড়াই করেছিল। সুতরাং এটি অর্জনের জন্য অনুরূপ মেয়াদ লড়াই করতে হবে।

---

[৪] মুহাম্মদ হারব, *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৫৮।
[৫] প্রাগুক্ত : ৫৭।

ফুয়াদ পাশাকে প্রশ্ন করা হলো, এখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ কোনটি?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, এখন সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ উসমানি সাম্রাজ্য। কারণ আপনারা এটি বাইরে থেকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন আর আমরা একে অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করতে চাচ্ছি, কিন্তু আমরা দুজনই ব্যর্থ হচ্ছি।[৬]

আবদুল হামিদ এই সংলাপ থেকে উসমানি সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে আগ্রহী এমন শক্তিগুলোকে নিস্তব্ধ করার ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সংলাপে বুদ্ধিমত্তা শেখেন। পরবর্তীকালে তিনি এ ব্যাপারে আরও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এই সফরের সময় আবদুল হামিদের বয়স ছিল ২৫ বছর।

দুই. খিলাফতের বায়আত ও সংবিধান ঘোষণা

তার ভাই মুরাদের পরে ১১ শাবান ১২৯৩ হিজরি (২৩ আগস্ট ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার তার হাতে খিলাফতের বায়আত নেওয়া হয়। ৩৪ বছর বয়সে তিনি এ পদে অভিষিক্ত হন। তোপকাপিতে অনুষ্ঠিত তার খিলাফতের অভিষেক অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সিনিয়র সিভিল অফিসার এবং সামরিক অফিসাররা যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধানরাও তাকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানটি উদযাপনের লক্ষ্যে সালতানাতের সর্বত্র কামানের গোলা বর্ষণ করা হয়। গোটা ইস্তাম্বুলজুড়ে তিন দিনের জন্য আলোকসজ্জা ও আনন্দ অনুষ্ঠান উদযাপিত হতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেলিগ্রামের সাহায্যে এই বার্তা পাঠান।[৭]

সুলতান আবদুল হামিদ মিদহাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তিনি নাগরিক স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়ে এবং সংসদীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ করে সংবিধান ঘোষণা করেন।

এই সংবিধানমতে সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত; এক. প্রতিনিধি পরিষদ বা রাষ্ট্রদূতগণ, দুই. সিনেট সংসদ।[৮]

শাসনকালের শুরুতে সুলতান আবদুল হামিদ মন্ত্রীদের অন্যায় আচরণের শিকার হন। বৈদেশিক নীতি দ্বারা প্রভাবিত নব্য-উসমানি সোসাইটির নেতাদের দ্বারাও তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাকে। যার মধ্যে পশ্চিমাদের দ্বারা প্রভাবিত অভিজাত শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। ম্যাসানিক শক্তিগুলো নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে তাদের ব্যবহার

[৬] প্রাগুক্ত : ৫৮।
[৭] *আদদাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস* : ১৮৩।
[৮] প্রাগুক্ত : ১৭৮।

করে। সরকারে মন্ত্রীদের বাড়াবাড়ি এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মিদহাত পাশাও নব্য উসমানি সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন।

ক্ষমতায় আরোহণের শুরুর দিকে সুলতান আবদুল হামিদকে মিদহাত পাশা লেখেন, 'সংবিধান ঘোষণায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্বৈরশাসন নিপাত ও অত্যাচার দমন করা। আপনার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা, মন্ত্রীদের বেতন নির্ধারণ করা। সমস্ত মানুষকে তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া, যাতে আমাদের দেশ উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আমি আপনার নির্দেশনা কেবল ওই সময়ই বাস্তবায়ন করব, যখন তা জাতির স্বার্থবিরোধী না হবে।'[৯]

সুলতান আবদুল হামিদ এ ব্যাপারে বলেছেন, 'আমি দেখছি, মিদহাত পাশা নিজেকে আমার উপর হুকুমদাতা মনে করছে। নিজের ব্যাপারে সে গণতন্ত্র থেকে বহুদূরে এবং স্বেচ্ছাচারের অনেক নিকটবর্তী।'[১০]

মিদহাত পাশা ও তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন মাদকাসক্ত। সুলতান আবদুল হামিদ তাঁর স্মৃতিচারণে লেখেন, 'এটি প্রসিদ্ধ যে, সংবিধানার্থে খসড়া প্রকাশের সন্ধ্যায় তখনকার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা মিদহাত পাশার প্রাসাদে জড়ো হয়েছিল। তবে এটা রাষ্ট্রের বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য নয়; বরং মদপান এবং বেলেল্লাপনায় মত্ত হওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মিদহাত পাশা যৌবনের শুরু থেকেই মাদকাসক্ত ছিলেন। আমি তাকে সংবিধানের ঘোষণা দিতে পাঠানোর সময় মাতাল দেখেছি। তখন মিদহাত পাশা অন্যের হাতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল, যাতে মাটিতে পড়ে না যায়। সে যখন হাত ধৌত করে। সে সময় তিনি তার বোনজামাই তুসুন পাশাকে মাতাল অবস্থায় বলেছিলেন—'হে পাশা, কে এখন আমাকে আমার পদ থেকে সরাতে সক্ষম? কে? বলুন আমি কত বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সামনে নেতৃত্ব দেব?'

তুসুন পাশা জবাব দিলেন, 'আপনি যদি এভাবেই থাকেন; তবে এক সপ্তাহের বেশি নয়।'[১১]

মিদহাত পাশা, তার মদের আসরে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনেক গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দিতেন। পরদিন এই গোপন বিষয় ইস্তাম্বুলের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এক রাতে মিদহাত পাশা উসমানীয় সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র ঘোষণার তার অভিপ্রায় সম্পর্কে বলে বসেন। শুধু তাই নয়; ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে যেমনটি ঘটেছিল, তেমনি

[৯] মুহাম্মদ হারব, *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৫৯।
[১০] প্রাগুক্ত : ৬০।
[১১] মুহাম্মদ হারব, *মুজাকারাতুস সুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৭৭।

নতুন উসমানি প্রজাতন্ত্রের তিনি রাষ্ট্রপতি এবং তারপরে একজন সম্রাট হয়ে উঠবেন—বলেও মন্তব্য করে বসেন।

সুলতান আবদুল আজিজ হত্যাকাণ্ডে মিদহাত পাশা জড়িত বলে অভিযোগ ছিল। সুলতান আবদুল হামিদ এটি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তারপরে তিনি অভিযোগকারীদের আদালতে হাজির করলে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। মিদহাত পাশাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সুলতান আবদুল হামিদের হস্তক্ষেপে সাজা কমিয়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে মিদহাত পাশাকে হিজাজে নির্বাসিত করা হয়, সেখানে ছিল মিলিটারি কারাগার।

বাহ্যত সংবিধানে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিধান ছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমুদয় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকার ছিল একজনের হাতে। অনুরূপভাবে, সরকার-ব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তাকে উন্নয়ন-বিষয়ক বলা চলে। কেউ সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার বিষয়ে আপত্তি তোলার চিন্তাও করতে পারত না। সংবিধানে বলা আছে, সুলতানের ব্যক্তিত্বে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সুলতান কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এককথায়, এটা ছিল একজন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংবিধান।[১২]

মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকার ছিল একজনের হাতে। তিনি বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করবেন এবং যুদ্ধ ও শান্তিচুক্তি ঘোষণা করবেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁর পক্ষে পার্লামেন্টের পরিষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন জারি করার অধিকার রয়েছে।

এভাবে সুলতান আবদুল হামিদের হাতে তাঁর পূর্বসূরিদের কর্তৃত্বের মতোই ১২৯৩-১৩২৭ হিজরি (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত ক্ষমতা রয়ে গেল। তার একচ্ছত্র ক্ষমতার বিপক্ষে সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ করে মিদহাত পাশা এবং তিনিই এর প্রথম শিকার হন। সংবিধান দ্বারা সুলতানকে যে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পেরেছেন। কেননা রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী। মূল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সুলতান।[১৩]

সংবিধানে সংসদসদস্যদের মত ও ভোট দেওয়ার স্বাধীনতার বিধান ছিল এবং কাউন্সিলের আইনের সীমা অতিক্রম না করা হলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না মর্মেও ধারা ছিল। এই সংবিধান লেখা হয় তুর্কি ভাষায়। কেননা, এটাই ছিল রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। সভা-সমাবেশে এই ভাষাতেই কথা বলতে হতো।

---

[১২] *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি* : ২৩৪।
[১৩] প্রাগুক্ত।

সংবিধানে এটাও বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে গোপনে বা প্রকাশ্যে ভোট প্রদান করা যাবে। সাংবিধানিকভাবে সুলতানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পার্লামেন্ট বাজেট ঘোষণা করতে পারবে। কিন্তু সব ধরনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সুলতানই হচ্ছেন সর্বোচ্চ অথরিটি।

ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে সংবিধান ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল সদস্য উসমানি জাতির নাগরিক হিসেবে গণ্য। এতে কোনো প্রকার ভিন্নতা নেই। যে যে ধর্মেরই হোক, আইনের চোখে সবাই সমান। সকল নাগরিকের উপর একই ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পিত হবে। সকলের অধিকার সমান। সংবিধান বিচারবিভাগের স্বাধীনতারও ঘোষণা দেয়। শরয়ি আদালতকে বলা হয়, অমুসলিমদের ধর্মীয় বিষয়াদি তাদের ধর্মীয় আদালতে নিষ্পত্তি হবে।[১৪]

সুলতান আবদুল হামিদ আদেশ দিয়েছিলেন, সংবিধান কার্যকর করা হবে এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উসমানীয় ইতিহাসে এটি হবে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলে মুসলমানদের ৭১ আসন, খ্রিষ্টানদের ৪৪ আসন এবং ইহুদিদের ৪ আসনে প্রার্থী নির্বাচিত হন। ২৯ মার্চ ১৮৭৭ (১২৯৪ হিজরি) সালে প্রথম উসমানি সংসদীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জন মুসলিম এবং ৪ জন অমুসলিম সদস্য নিয়ে ২৬ জনের সিনেট গঠিত হয়। এ ছাড়া ১২০ সদস্যের সমন্বয়ে সংসদ প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হয়। অধিবেশন চলাকালে কিছু আরবপ্রতিনিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সংসদ প্রতিনিধি পরিষদের মেয়াদ ছিল খুবই কম। কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। ১২৯৬ হিজরি (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) সনে প্রতিনিধি পরিষদের কিছু সদস্য তিনজন মন্ত্রীকে সংসদে জবাবদিহির দাবি তোলেন। কেননা সেই তিনজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ ছিল। সুলতান আবদুল হামিদ মন্ত্রীদের রক্ষায় এগিয়ে এসে অধিবেশন মুলতবি করেন। প্রতিনিধি পরিষদদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর আদেশ দেন এবং বহু সদস্যকে বহিষ্কার করে নির্বাসনে পাঠান।[১৫]

কাউন্সিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের সময়কাল ছিল ১০ মাস ২৫ দিন। পরবর্তী তিন বছর আর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। সংসদ ভবন বন্ধ পড়ে থাকে।[১৬] সুলতান আবদুল হামিদ ম্যাসানিক চাপের কারণে মিদহাত পাশার অধীনে সংবিধান ঘোষণা করতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু সুযোগ পেয়ে তিনি অধিবেশন মুলতবি করে দেন।

---

[১৪] ড. ইসমাইল বাগি, *আদদাওলাতুল উসমানিয়া*: ১৮০।

[১৫] প্রাগুক্ত : ১৮১।

[১৬] সাতিহ আল-হাসরি, *আল-বালাউল গাযানিয়া ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়া*: ৯৯-১০০।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং সংবিধানের বিরোধী ছিলেন। এ ছাড়া সাংবিধানিক রাজতন্ত্রও (যাকে উসমানিরা শর্তসাপেক্ষ সরকার আখ্যা দিত) তাঁর পছন্দ ছিল না। সাংবিধানিক সরকার শাসককে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেয়। সুলতান মনে করতেন এটা পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আগত চিন্তা-ভাবনা, উসমানি সাম্রাজ্যে তা কার্যকর অসম্ভব। এ কারণে যারা গণতন্ত্র ও সংবিধানের কথা বলত, তিনি তাদের পছন্দ করতেন না। এ জন্যই সুলতান তাঁর প্রধানমন্ত্রী মিদহাত পাশাকে পছন্দ করতেন না। মিদহাত পাশার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সে ইউরোপীয় গণতন্ত্র ছাড়া কিছুই দেখে না। সে গণতন্ত্রের উপায়-উপাদান ও কুপ্রভাব সম্পর্কে অবগত নয়। ঋণের বড়ি রাষ্ট্রের সব রোগ সারাতে পারে না। বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ইমারত তৈরির পক্ষে আমি নই। আমার মতে, গণতন্ত্র প্রতিটি জাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। সবাই এ থেকে উপকার পাবে—বিষয়টি আদৌ এমন নয়। প্রথমে আমার ধারণা ছিল এটা একটা কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা, তবে এখন আমি এর ক্ষতির ব্যাপারে নিশ্চিত।'[১৭]

গণতন্ত্রের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সুলতানের কাছে যুক্তি ও প্রমাণ ছিল। একটি প্রমাণ হচ্ছে, 'সংবিধান ঘোষণার সময় সংবিধানের দাবিদাররা সুলতানের কাছে যে অনুরোধ করেছিল, তাতে সংবিধানের দোহাই দিয়ে তাদের অনধিকারচর্চার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তারা প্রাপ্য অধিকারকে ভুল খাতে ব্যবহার শুরু করে। তারা তখন বিভিন্ন রাজ্যে খ্রিষ্টান গভর্নর নিয়োগসহ কয়েকটি সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করতে সুলতানকে অনুরোধ করেছিল; অথচ সেখানকার জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল মুসলিম।'

অনুরূপভাবে, মিলিটারি কলেজে খ্রিষ্টান শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর অনুরোধ জানায়, যেখানে উসমানি সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। আবদুল হামিদ তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। মন্ত্রী মিদহাত পাশা তখন জোর দিয়ে সুলতানকে বলেছিলেন, 'অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটাতে সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং মহামান্য, আপনাকে অবশ্যই আপনার কর্তব্য সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।'[১৮]

সুলতান আবদুল হামিদ গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি বিতৃষ্ণার আরেকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, 'উসমানি সাম্রাজ্য হচ্ছে এমন একটি সালতানাত, যেখানে একসাথে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে থাকে। এ-জাতীয় দেশে গণতন্ত্র কার্যকর করা সম্ভব নয়। এর

[১৭] মুহাম্মাদ হারব, *মুজাক্কারাতুস সুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৮০।
[১৮] *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ৯৫।

দ্বারা দেশের মূলনীতির মৃত্যু ঘটবে। ইংরেজ সংসদে কি কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি আছেন? ফরাসি সংসদে কি একজন আলজেরিয়ান প্রতিনিধি আছেন?'[১৯]

সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও তার দেশে সাংবিধানিক শাসনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। লোকেরা সাংবিধানিক শাসন শুরু করলে তিনি বলেছিলেন, 'শর্তসাপেক্ষ সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে কী লাভ হয়েছিল? আপনি কি ঋণের বোঝা কমাতে পেরেছেন? অনেক সড়ক, বন্দর এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে? আইন কি এখন আরও যুক্তিসঙ্গত? ব্যক্তিগত সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা কি বিরাজ করছে? মানুষ কি আরও সমৃদ্ধ? মৃত্যু কি হ্রাস পেয়েছে? জন্মহার বেড়েছে? বিশ্ব জনমত কি এখন আমাদের পক্ষে আগের চেয়ে বেশি? একটি উপকারী ওষুধ অপচিকিৎসকের হাতে থাকলে তা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যখন চিকিৎসক এর ব্যবহারের সূত্র ও পদ্ধতি না জানবেন, তখন এটি প্রাণঘাতী হিসেবে বিবেচিত হবে। আমার অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে, পরিস্থিতি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করছে।'[২০]

সুলতান আবদুল হামিদ ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তাঁর অবস্থান সবসময় রাজতান্ত্রিক শাসনের পরিপন্থি নয়; বরং যে পরিস্থিতিতে তা কার্যকর করা হচ্ছে, তখনকার সময়ের জন্য বিরোধী। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'এটা ভাবা উচিত নয় যে, শর্তসাপেক্ষ সরকারব্যবস্থা আমি চিরদিনের মতো ঘোরবিরোধী।'[২১]

সুলতান আবদুল হামিদ তাঁর সময়ে কঠিন পরিস্থিতিতে গুরুতর সংকট কাটিয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশ থেকে উসমানি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল অবিরাম। রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে তিনি ইসলামি সভ্যতা, শিক্ষা ও চেতনার আলো ছড়াবার চেষ্টা করেন। দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেন। নামধারী লেখক ও পশ্চিমাপন্থি সাংবাদিকতার সাথে জড়িতদের রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সয়লাব থেকে রাজ্যগুলোকে মুক্ত রাখার ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য শক্তিশালী গোয়েন্দা পরিষেবা গঠন করেন। এর মাধ্যমে বিদেশি শত্রুদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তারা দেশ-বিদেশের যাবতীয় গোপন খুঁটিনাটি বিষয় সুলতানকে অবহিত করত।

---

[১৯] প্রাগুক্ত।
[২০] প্রাগুক্ত : ৯৬।
[২১] প্রাগুক্ত।

সুলতান ইসলামি ঐক্যের ব্যাপারেও আগ্রহী হন এবং এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে দুর্দান্ত ফল অর্জিত হয়। ইউরোপীয়রা সুলতানের এই গভীর কৌশলগত পরিকল্পনায় ঘাবড়ে যায়। তার চিন্তাধারা ব্যর্থ করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

সুলতান আবদুল হামিদ তার গোয়েন্দা সংস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'উসমানি রেওয়াজ মতে, সুলতান একদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণের ভাবনা ও অভিযোগ, নিজ শাসন ও বিচারের ব্যাপারে তাদের মতামতের তথ্য অর্জন করে থাকেন, অন্যদিকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খানকাহ, দরবেশদের দরগাহের ব্যাপারেও তথ্য অর্জন করতেন। তাদের চিন্তাধারা ও ভাবনাগুলো সমন্বয় করে সেইমতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাদের থেকে পথনির্দেশনা নিতেন।

'আমার দাদা সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ গোয়েন্দা বিভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী করেন। যাযাবর দরবেশদের যুক্ত করে তাঁর গোয়েন্দা শাখা সম্প্রসারণ করেছিলেন, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতেন। আমি সিংহাসনে আরোহণের সময়ও এটি ছিল এবং আমি তা কার্যকর রেখেছি।

আমি একবার লন্ডনে আমাদের রাষ্ট্রদূত মওসুরুস পাশার মাধ্যমে জানতে পারলাম, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আসকার হুসাইন আউনি পাশা ইংরেজদের থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। যেই প্রধানমন্ত্রী বাদশাহর নামে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন, তিনি যদি রাষ্ট্রের সাথে এমন প্রতারণা করে বসেন, তাহলে তো গোয়েন্দাদের বিষয়টি খলিফা পর্যন্ত পৌঁছানো জরুরি। এই প্রতারণার একটা বিহিত হওয়াও আবশ্যক, যাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা নিজ নিজ পদের অপপ্রয়োগ না করতে পারেন এবং আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্য জেনে আমি খুব দুঃখ পাই। ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ি। সেই দিনগুলোতে মাহমুদ পাশা আমার কাছে আসেন এবং তরুণ তুর্কিদের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য দেন। এটা আমার জানা জরুরিও ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব তথ্য আপনি কীভাবে পেলেন? তিনি বললেন, তার একটি ব্যক্তিগত গোয়েন্দা এজেন্সি আছে। তারা তরুণ তুর্কির বিভিন্ন সদস্যকে লোভের টোপে ফেলে এসব তথ্য জেনে নিয়েছে। এরা টাকার লোভে সঙ্গীদের সংবাদ পরিবেশন করত। পরে সেই সংবাদ চলে আসত আমার কাছে।

এটা সত্য যে, তিনি আমার ভগ্নীপতি। তবে কারও পক্ষে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের বাইরে ব্যক্তিগত গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা ঠিক নয়। আমি তাকে বললাম, আপনার গোয়েন্দা এজেন্সি বন্ধ করে দিন। তিনি এ কথা শুনে বেশ উদ্বিগ্ন হলেন।

একটি রাষ্ট্র কখনো সুরক্ষিত থাকতে পারে না যদি প্রধানমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের লোককে বিদেশিরা তাদের লক্ষ্য পূরণে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। এর ভিত্তিতেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি গোয়েন্দা পরিষেবা চালু করব, যাকে আমাদের শত্রুরা 'ইন্টেলিজেন্স' বা গোয়েন্দা পুলিশ বলে থাকে।

এটাও জানা দরকার ছিল যে, গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন ও যাচাই-বাছাই না করে এই বিভাগ থেকে আসা কোনো তথ্যই গ্রহণ করিনি।

আমার দাদা সুলতান তৃতীয় সালিম বলতেন, বিদেশিদের কালো হাত আমার লিভারের উপর আক্রমণোদ্যত। তাই আমাদের উচিত, বিদেশে আমাদের দূত পাঠিয়ে ইউরোপীয় উন্নয়ন-নীতির সাথে পরিচয় লাভ করা। বিদেশে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা যত দূর সম্ভব কাজে লাগানো দরকার।

আমি অনুভব করছি, আমিও ওই বিদেশিদের লক্ষ্যে পরিণত, কিন্তু আমার কলিজাটা তাদের পাঞ্জামুক্ত। তারা আমার প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীকে কিনে নিয়েছে। তাদেরকে আমার দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কীভাবে এমনটি ঘটতে পারে; অথচ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আমি তাদের ব্যয়ভার নির্বাহ করি? আমি জানি না তারা কী করে? কী ধারণা করে? কীসের প্রস্তুতি নেয়? হ্যাঁ, আমি গোয়েন্দা পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমি এটি চালিয়ে যাচ্ছি।

এসব কখন হলো?

এরপর আমি দেখলাম, আমার প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ঘুষ নিয়ে রাষ্ট্র ধ্বংস এবং আমার ক্ষমতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আমি দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উত্তোলনের নিমিত্তে এই গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করিনি। বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতনভোগীদের মধ্যে যারা আমার রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের সন্ধান করার জন্য, তাদের মুখোশ উন্মোচনের লক্ষ্যে এই বিভাগ চালু রেখেছি।'[২২]

ঐক্য ও প্রগতি সংঘের নেতারা গোয়েন্দা ব্যবস্থার জন্য সুলতান আবদুল হামিদের তীব্র সমালোচনা করে। অথচ বাস্তবে এটি উসমানি সাম্রাজ্যের পক্ষে দুর্দান্ত ইতিবাচকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করা এবং উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত আর্মেনিয়ান সন্ত্রাসীদের দমন করতে গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট

[২২] *মুজাক্কারাতুস সুলতান আবদুল হামিদ আসসানি* : ১৬০।

দক্ষতা দেখায়। সুলতান আবদুল হামিদের ৩০ বছরের শাসনকালে এই বিভাগ প্রতিটি বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের উত্থানের সাথে সাথেই সুলতানকে অবহিত করে যায়। সময়মতো সংবাদ পাওয়ায় সুলতান তখনকার প্রতিটি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৩]

তিন. বলকানের ষড়যন্ত্র ও বিপ্লব

মন্টিনিগ্রো এবং সার্বিয়ার জনগণ হার্জেগোভিনার খ্রিষ্টান সম্রাটের নেতৃত্বে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। ১২৯৩ হিজরি (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) সনে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুলতান আবদুল হামিদ ইউরোপীয় দেশগুলোকে উসমানি সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। নির্বাহী কর্তৃপক্ষ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত জারি করেছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে করের সাম্য বজায় রাখেন। কিন্তু এখানকার জনগণ এতে সন্তুষ্ট হয়নি। তারা পুনরায় বিপ্লব করে বসে, যা দমনও করা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিল অস্ট্রিয়া। তারা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা একীভূত করার লক্ষ্যে জনগণকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উসকে দিতে থাকে। অস্ট্রিয়া রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের সাথে মিলে সুলতান আবদুল হামিদের কাছে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের দাবি জানায়।

তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুলতান সংস্কারের আশ্বাস দেন। কিন্তু এতে বসনিয়ার খ্রিষ্টানরা রাজি হলো না। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কারের দাবি ছিল একটি অজুহাত মাত্র। এই বাহানায় তারা উসমানিদের দুর্বল করতে এবং উৎখাত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে চায়।

যেসময় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার খ্রিষ্টানরা বিপ্লবে জড়িয়ে পড়ে, ঠিক সেসময় বুলগেরিয়ায়ও বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেখানকার খ্রিষ্টানরা অস্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় দেশসমূহ, বিশেষত রাশিয়ার সমর্থন নিয়ে বিদ্রোহ করে। অর্থোডক্স খ্রিষ্টান এবং সালকাভের মধ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার করার জন্য বুলগেরিয়ানদের কিছু সংগঠন সারাদেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা রাশিয়ান অস্ত্র দ্বারা শক্তি লাভ করেছিল। এই সংগঠনগুলো সার্বিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জনগণকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করত। উসমানি সাম্রাজ্য কিছু সার্কাসিয়ান পরিবারকে নামিয়ে আনলে বুলগেরিয়ানরা প্রতিবাদ করল এবং বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ল। তাদেরকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্য বিপ্লব নির্মূল করতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় দেশগুলো প্রোপাগান্ডা ছড়াতে লাগল যে, উসমানিরা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গণহত্যায়

[২৩] ড. ইসমাইল বাগি, *জাদদাওলাতুল উসমানিয়া*: ১৮৯।

নেতে উঠেছে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। কেবল বিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। এই প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে ইউরোপের সাধারণ জনগণ চলে গেল উসমানিদের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয়রা উসমানিদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিল। তাদের একটি দাবি ছিল—বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা এবং সেখানে একজন খ্রিষ্টান শাসক নিযুক্ত করা।[২৪]

রাশিয়ান, জার্মান এবং অস্ট্রিয়ানরা উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রোকে চাপ দেয়। কেননা, রাশিয়া বুলগেরিয়া পর্যন্ত তাদের সীমানা প্রশস্ত করতে চাচ্ছিল। এদিকে, অস্ট্রিয়া বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনাকে একসাথে করে নিজেদের প্রসারিত করতে চাচ্ছিল। এই দেশগুলো সার্বিয়ান এবং মন্টিনিগ্রিন প্রশাসকদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাশিয়ান সৈন্যরা গোপনে অতর্কিত সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে আক্রমণ করে বসে। শুরু হয়ে যায় যুদ্ধ। উসমানি সাম্রাজ্য সার্ব এবং তাদের মিত্রদের উপর জয়লাভ করতে সক্ষম হয় এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর মনোবাঞ্ছা ব্যর্থ করে দেয়। এমন সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশ হস্তক্ষেপ করে এবং যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায়। তারা হুমকি দিয়ে বলে, যুদ্ধ বন্ধ না করলে বিশাল যুদ্ধ চালানো হবে।[২৫]

ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিরা ইস্তাম্বুলে বৈঠক করে। তারা কিছু প্রস্তাব পেশ করে। তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হচ্ছে—বুলগেরিয়াকে দুই রাজ্যে ভাগ করে নেওয়া এবং খ্রিষ্টান গভর্নর নিযুক্ত করা। সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা। পাশাপাশি বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকেও সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান। সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর কিছু এলাকার দখলদারিত্ব ছেড়ে দেওয়া।

তবে উসমানি সালতানাত এই সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল। সার্বদের সাথে এককভাবে উসমানিরা সন্ধিচুক্তি করে নেয়। যার ফলে উসমানি সেনাবাহিনী সার্বিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং উসমানি সার্বভৌমত্বের প্রমাণ হিসাবে উসমানি ও সার্বিয়ার পতাকা উত্তলন করা হয়।

দ্বিতীয় সুলতান আবদুল হামিদ নিশ্চিত ছিলেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে উসমানি সাম্রাজ্যের পতন। তিনি তার ডায়েরিতে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন, 'ইস্তাম্বুলে বড় বড় দেশগুলো কী করতে চাচ্ছিল, তা আমি দেখেছি। যা তারা বলেছে, তা মোটেই সঠিক নয়। যেমন তারা বলে, তাদের খ্রিষ্টান নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে। বরং প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, তারা নাগরিকদের স্বাধীনতার কথা বলে পরে

[২৪] প্রাগুক্ত।
[২৫] ড. ইসমাইল বাগি, *আলদাওলাতুল উসমানিয়া*: ১৯০।

তাদের স্বায়ত্তশাসনের জন্য চাপ দেবে। এভাবে ধীরে ধীরে উসমানি সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করাই তাদের লক্ষ্য।'

তারা এই লক্ষ্য দুটি উপায়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে—

১. খ্রিষ্টান জনগণের মাঝে বিদ্রোহের উত্তেজনা ছড়িয়ে রাষ্ট্রের পরিবেশ অস্থিতিশীল করা এবং পরে তা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করা।

২. আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে গণতন্ত্রের কথা বলা দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের মধ্য হতে এমন কিছু লোক তারা পেয়ে যায়, **যারা** তাদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, শত্রুরা রুটির উপর কিছু ঘি মাখিয়ে দিয়েছে। আমাদের কিছু শিক্ষিত উসমানি যুবক এটা বুঝতে পারছে না যে, জাতীয় ঐক্যের অধিকারী একটি দেশে সহজে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসনের প্রয়োগ সফলতা পেতে পারে না। উভয় পদ্ধতির দেশের আমাদের তরুণরা গণতন্ত্রের প্রায়োগিক কার্যকারিতার পার্থক্য করতে পারে না। শত্রুদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে এরা ব্যবহার হয়ে আসছে এবং স্বদেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।'[২৬]

চার. রাশিয়া এবং উসমানি সাম্রাজ্যের যুদ্ধ

রাশিয়া ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক উপকরণের মাধ্যমে উষ্ণ জলাধার পর্যন্ত পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা করত। গ্রেট পিটার (১৬২৭-১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ) নিজ অসিয়তের ৯, ১১ ও ১৩ নং অনুচ্ছেদে রাশিয়ানদের কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'উসমানি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত উসমানিদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে।'

অসিয়তের নবম অনুচ্ছেদে গ্রেট পিটার বলেছেন, 'কনস্টান্টিনোপল এবং ভারতের যথাসম্ভব কাছাকাছি আমরা চলে এসেছি। যে কনস্টান্টিনোপলের মালিকানা পাবে, সে বিশ্বের মালিকানা পেয়ে যাবে। এই লক্ষ্যে উসমানীয়দের সাথে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

একাদশ অনুচ্ছেদে বলেছেন, 'উসমানীয়দের ইউরোপ থেকে বিতাড়নের লক্ষ্যে আমরা অস্ট্রিয়াকে সঙ্গ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। কেননা আমরাও তা চাই।'

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'উসমানি রাজ্যগুলোতে আধিপত্যের পরে আমরা আমাদের সেনাসমাবেশ ঘটাবো। আমাদের নৌবহর বাল্টিকসাগর এবং কৃষ্ণসাগরে নিয়ে

---

[২৬] *মুজাকারাতুস সুলতান আবদুল হামিদ আসসানি*: ১৪৫।

যাব। এরপর পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সাথে আলোচনা শুরু করবো।'[২৭]

রাশিয়া এই উপদেশ মতে কাজ করে। দ্বিতীয় সুলতান আবদুল হামিদের যুগে বলকান, গ্রিস এবং অন্যান্য উসমানি প্রদেশে রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সমর্থনে কয়েক দফা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রিসের মতো রাজ্যগুলোও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিল। বলকানে উসমানিরা অসাধারণ বিজয় অর্জনের পরে রাশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়।[২৮] তারপরে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিরলস যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। রোমানিয়াও রাশিয়ার সাথে যোগদান করে। উসমানিরা রাশিয়ানদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রাশিয়ার সেনাবাহিনী দানিউব পেরিয়ে এবং উসমানি সাম্রাজ্যের কিছু এলাকা দখল করে নেয়; যাকে টিরনো ও অ্যানিকোলি বেল বলা হয়, যা বর্তমানে বুলগেরিয়ায় অবস্থিত।

এ ছাড়া রাশিয়ানরা বলকানের দিকে অগ্রসর হওয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং পথ দখল করে নেয়। সুলতান আবদুল হামিদ রাশিয়ান আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য উসমানি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। রাশিয়ানরা বেলফনা শহর দখল করার চেষ্টা করেছিল। এটা বলকানদের নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে দুঃসাহসী উসমানি নেতা উসমান পাশা তাদের রুখে দাঁড়ান সাহসিকতার সাথে। রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। রাশিয়া আরও সেনা পাঠিয়ে আবার তাদের উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এবারও তাদের পরাজয় স্বীকার করে ফিরে যেতে হয়। উসমানীয় সুলতান আবদুল হামিদ বীর সেনাপতি উসমান পাশার প্রশংসা করে একটি বিশেষ আদেশ জারি করেছিলেন।[২৯]

---

[২৭] ইবরাহিম হালমি বেগ, *আততুহফাতুল হালিমিয়া* : ২৪১।

[২৮] রুশ–তুর্কি যুদ্ধ (১৮৭৭–১৮৭৮) (তুর্কী: ৯৩ Harbi) ছিল অটোমান সাম্রাজ্য এবং রাশিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সমন্বয়ে গঠিত ইস্টার্ন অর্থোডক্স মৈত্রীজোটের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। বলকান ও ককেসাস অঞ্চলে সংঘটিত এই যুদ্ধটির সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলকান অঞ্চলে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ থেকে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার, কৃষ্ণ সাগরে রুশ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বলকানের জাতিগুলোকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকে সমর্থন প্রদান – রাশিয়ার এই লক্ষ্যগুলোও এই যুদ্ধের পেছনে বড় কারণ ছিল।

রুশ-নেতৃত্বাধীন জোটটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়। এর ফলে রাশিয়া ককেসাস অঞ্চলে কার্স ও বাটুমসহ বেশ কয়েকটি অটোমান প্রদেশ দখল করে নিতে সক্ষম হয়, এবং বুদজাক অঞ্চলটিও দখল করে নেয়। রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো আনুষ্ঠানিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রায় পাঁচ শতাব্দীব্যাপী অটোমান শাসনের (১৩৯৬–১৮৭৮) পর বুলগেরীয় রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এর সীমা দানিয়ুব নদী থেকে বলকান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (কেবল উত্তর দব্রুজা অঞ্চলটি রুমানিয়ার অন্তর্গত হয়), এবং সোফিয়া অঞ্চলটিও রাষ্ট্রটির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৮ সালের বার্লিন সম্মেলন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং গ্রেট ব্রিটেনকে সাইপ্রাস দখলের সুযোগ করে দেয়।—*উইকিপিডিয়া।*

[২৯] *আল-কুতুবুল ইসলামিয়া* : ৪১৮।

এই অবিচলতার মুখোমুখি হয়ে রাশিয়ানরা তাদের এই শহর দখলের নীতিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। তারা শহরের চারদিক অবরোধের নীতি অনুসরণ করে। একইসাথে সেখানে উসমানীয় সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের পথও বন্ধ করার চেষ্টা করে। তারা তাদের বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং রাশিয়ান জার নিজেই পরবর্তী যুদ্ধে যোগদান করেন। রোমানিয়ার প্রশাসকও রাশিয়ার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের হাতে ছিল এক লাখের অধিক যোদ্ধা।

সৈন্যসংখ্যা রাশিয়ানদের পক্ষে ভারী হয়ে ওঠে। তাদের সেনা ১ লাখ অতিক্রম করে দেড় লাখ ছাড়িয়ে যায়। তারা উসমানি বাহিনীর উপর তিনটি ফ্রন্ট থেকে অবরোধ করে। তবে উসমান পাশার নেতৃত্বে উসমানি বীরগণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। যদিও তাদের সেনাসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার। তারা কেবল নিজেদের প্রতিরক্ষাই করেনি; বরং অবরোধকারী শত্রুশিবিরে চরম আঘাতও হেনেছে। তাদের মনে ছিল কেবল একটাই কামনা, তারা বিজয় লাভ করবে, অবরোধ ভেঙে ফেলবে বা শাহাদাতের অমীয় সুধায় সিক্ত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

উসমান পাশা তার বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তারা শত্রু বাহিনীর উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যান। তাদের তাকবিরধ্বনির সাথে সাথে আকাশ-বাতাস কাঁপতে থাকে। বাহাদুর সৈনিকেরা প্রাণের তোয়াক্কা না করে শত্রুশিবিরে আক্রমণ চালায়। এতে তাদের বিশালসংখ্যক সৈনিক রাশিয়ান বাহিনীর হাতে শহিদ হয়। তা সত্ত্বেও তারা অবরোধের প্রথম ফ্রন্ট ভেঙে দ্বিতীয় ফ্রন্টে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। রাশিয়ানদের কিছু কামান উসমানিরা দখল করে নেয়। তৃতীয় ফ্রন্ট ভাঙন-প্রচেষ্টা চলছিল। এমন সময় সেনাপতি উসমান পাশা আহত হন। তার আহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সৈন্যদের মধ্যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে। তারা শহর প্রতিরক্ষার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায়। কিন্তু রাশিয়ান বাহিনী ইতোপূর্বে শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। শত্রুরা চারদিক থেকে আগুন নিক্ষেপ করতে থাকে। অবশেষে উসমানিরা রাশিয়ান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এটি ছিল ১২৯৪ হিজরি (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) সনের ঘটনা। উসমানি সেনাপতি উসমান পাশাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি তখন মারাত্মক আহত। রুশ বাহিনী তাকে এক নজর দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল, যার বীরত্ব-বাহাদুরির কারণে শত্রুদের মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। রুশ বাহিনী তার এমন অতুলনীয় কৃতিত্বে বিস্ময় প্রকাশ করে।[৩০]

রাশিয়ান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক উসমান পাশাকে তার দুর্দান্ত প্রতিরক্ষা কৌশলের জন্য অভিনন্দন জানান। তাঁর যুদ্ধ-দক্ষতা এবং ধৈর্যের জন্য সম্মান জানিয়ে তাকে ফিরিয়ে

[৩০] *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি*: ১৪১।

দেন তার অস্ত্রপাতি। তিনি একই বছরের ডিসেম্বরে উসমান পাশাকে রাশিয়ায় প্রেরণ করেন। রুশ জার তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। তার সাথে বন্দিসুলভ আচরণ করা হয়নি।

রাশিয়ানদের এই বিজয় বলকান অঞ্চলে সার্বিয়ানদেরকে উসমানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উৎসাহিত করে। তাদের সেনাবাহিনী সেখানে উসমানি অবস্থানগুলোতে আক্রমণ করে বসে। ফলে রাশিয়ার কাছ থেকে উসমানিদের মনোযোগ সরে যায়, যারা একইসাথে নতুন অঞ্চল জয় করার চেষ্টা করছিল। প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়ানরা সোফিয়াকে (এখন রোমানিয়ার রাজধানী) পরোক্ষভাবে আগেই দখল করে নিয়েছিল। রাশিয়ানরা কেবল এতেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং দক্ষিণে পুরোনো উসমানি রাজধানীর দিকে গিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরের ফ্রন্টগুলোতে পৌঁছে যায়। এদিকে উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও অত্যন্ত কঠিন রূপ ধারণ করেছিল।

একই সময়ে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উসমানি ও রাশিয়ানদের মধ্যে বহু লড়াই সংঘটিত হয়। একপর্যায়ে রাশিয়ানরা আনাতোলিয়ায় পৌঁছে যায়। তারপরও উসমানিরা তাদের পরাজিত করতে এবং রাশিয়ার ভূখণ্ডের ভেতরে তাদের তাড়া করতে সক্ষম হয়। আহমদ মুখতার পাশার নেতৃত্বে উসমানিরা ছয়টিরও বেশি যুদ্ধে রাশিয়ানদের পরাজিত করে। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এক ডিক্রিতে তাঁর প্রশংসা করেন। রাশিয়ানরা সেসব অঞ্চলে আবার আক্রমণ করে। তারা তখন উসমানি বাহিনীকে পরাস্ত করতে এবং আনাতোলিয়ার কিছু অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়।[৩১]

ইউরোপ ও এশিয়ায় পরাজয়ের মুখোমুখি হওয়ায় উসমানীয় সাম্রাজ্যকে রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে এবং তাদের সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই চুক্তিকে বলা হয় 'সান স্টেফানো'[৩২] চুক্তি। চুক্তিটি ৩ মার্চ ১৮৭৮ সালে স্বাক্ষরিত হয়। উসমানি সাম্রাজ্যের সাফওয়াত পাশা যখন চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন তখন তার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। উল্লেখ্য, চুক্তিটিতে এমন কিছু শর্ত ছিল, যা উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য ছিল বিধ্বংসী।[৩৩]

---

[৩১] *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়্যা*: ৪১৮।

[৩২] সান স্টেফানো (রাশিয়ান: Сан-Стефанский мир; সান-স্টেফানোর শান্তি; সান-স্ট্যাফ্যানিক মিউরিয়াম ডেভোভোর; সান-স্টেফানো, তুর্কি: আয়েস্তফানস মুয়াহেদেসি বা আয়েস্তাফানস আন্তসাশিসার শান্তি চুক্তি) রাশিয়া ও অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যকার চুক্তি ছিল।

[৩৩] *আসসুলতান আবদুল হামিদ আসসানি*: ১৪৪।